

কাজী নজরুল ইসলামের ‘মৃত্যুক্ষুধা’ : ভিন্ন জীবনবোধ

আমিনুর রহমান সুলতান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেছেন ‘বাধনহারা’ (১৯২৭), ‘মৃত্যুক্ষুধা’ (১৯৩০), ‘কুহেলিকা’ (১৯৩১)। উপন্যাস তিনটির শিল্পমূল্য নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তবে বিষয়চেতনায় নজরুলের উপন্যাসের সার্থকতা নিয়ে সংশয় নেই। বিশেষ করে ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসের বিষয়চেতনা জীবনবোধের ভিন্নসুরে আমাদের ভাবায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালকে দেখছেন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের পটভূমিতে। ফলে তাঁর লেখক মানস গঠিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ, খিলাফত, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে। এর সাথে কল্লোলের কালচেতনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ-শাসিত ঔপনিবেশ হওয়ায় আমাদের বাংলা বৃটিশদের দ্বারা প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে একাধিক ভাবে। সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৃটিশদের হস্তক্ষেপ বাংলার জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ‘কংগ্রেস’ (১৮৮৫), কিংবা ‘মুসলিম লীগ’ (১৯০৬) কোনো রাজনৈতিক দলই বৃটিশদের কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন কোনোটাই দানা বাঁধতে পারেনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হলে বাংলাসহ সমগ্র জাতিকে বৃটিশদের সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে হলো। তবে এই সহযোগিতার পশ্চাতে কাজ করেছিল স্বরাজ প্রাপ্তির প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে (১৯১৮) স্বরাজ এলোনা দেশে। বরং মনটেগু-চেমসফোর্ট সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯)-র প্রভাবে বাংলার সমাজ জীবন অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হতে থাকলো। হতাশায় নিমজ্জিত হতে থাকলো নিষ্ঠুর দমননীতিমূলক রাওলাট আইনের কবলে পতিত হয়ে। অবশ্য এই প্রতিবেশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলার জনজীবন প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ বয়ে নিয়ে আসে অনাকাজিত মৃত্যু। জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল জনসমাবেশে গুলি চালায় ইংরেজ সরকার। নিহত হয় অগণিত নিরীহ মানুষ। রাওলাট আইনের প্রতিবাদের অগণিত মৃত্যুর শোক সমগ্র জাতিকে শক্তিতে পরিণত করে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি জেগে ওঠে এসময়। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) খিলাফত আন্দোলন অবশ্য এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও খিলাফত আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় পুনর্জাগরনের জোয়ারে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। চিন্তা ও চেতনাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমান এই

সাহিত্যিকী

খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও যোগ দেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও এগিয়ে আসে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তবে উভয় সম্প্রদায়ের তখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজী। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতি দীর্ঘ কালের জড়তা মোচন করে যেন প্রচণ্ড বৈপ্লবিক চেতনায় সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে।^১ এসময় রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এর ফলে পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ মুক্তির নতুন পথের সন্ধান পায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের শোষণ-কবলিত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীদের মনে এই বিপ্লব গভীর রেখাপাত করে। শুধু তাই নয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে এই রুশ বিপ্লব।^২

এসব পরিপ্রেক্ষিত নজরুলকে আলোড়িত করেছিল। সহায়ক হয়েছিল নজরুলের লেখক মানস গঠনে। কল্লোলের সমকাল চেতনায় জনজীবনের যে অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যবোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সূতীব্র সংশয় ও জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় চরম রূপ ধারণ করেছিল বাংলার সমাজব্যবস্থায়-তা নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল। আর এরই প্রেক্ষাপটে নজরুল রচনা করেন ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসটি। ‘বাঁধনহারা’ কিংবা ‘কুহেলিকা’র ক্ষেত্রেও প্রেক্ষাপট স্মর্তব্য।

‘মৃত্যুক্ষুধার কাহিনী গড়ে উঠেছে কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক নামের একটি পাড়ায়। চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এ পাড়ায় একত্রে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণীর বহুবর্ণের মানুষের। বিষয়চেতনা হিসেবে উঠে এসেছে সমাজসচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপ্তি। অবশ্য রোমান্টিক প্রেম কাহিনীও চিত্রিত হয়েছে বটে কিন্তু সমাজ ও রাজনীতি চেতনার স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যত্যয় সৃষ্টি করেনি।

বহুবর্ণের, জাতের বাস এই চাঁদসড়কে। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান আর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট খ্রিষ্টানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়। হিন্দুও দু’চার ঘর আছে। এই পাড়ায় পুরুষেরা বিভিন্ন নিম্নপেশার সাথে সম্পৃক্ত। নিম্ন পেশার মধ্যে রয়েছে রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চি, কামার, কুলি, মেথর প্রভৃতি। মেয়েরাও ধানভানা সহ আরো বিভিন্ন পেশার কাজ করে। সবাই যে মিলেমিশে বাস করে এমন নয়। মাঝে মধ্যেই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে। তবে সব সময় তাদের মাঝে যা বিদ্যমান তা হলো অনন্ত অভাব দুঃখ, যন্ত্রনা, মৃত্যু।

অন্তত অভাব আর দৈন্যের মধ্যে একটি নিম্নবিত্তের মুসলমান পরিবারকে এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখানো হয়েছে। মুসলমান পরিবারটিতে রয়েছে তিনজন বিধবা বৌ। বড় বউ, মেজ-বৌ, সেজো বৌ নামে পরিচিত তারা। তাদের রয়েছে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, আঠার-উনিশ বছরের দোর প্যাকালে ও বৃদ্ধা শান্তুড়ী।

কাজী নজরুল ইসলামের ‘মৃত্যুক্ষুধা’ : ভিন্ন জীবনবোধ

বড় বৌ, মেজ বৌ ও সেজো বৌ-এর মধ্যে বড় বৌ সংসারের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বা ভুলবুঝাবুঝির সূত্রপাত হতে না দিয়ে উভয় পক্ষকে সামলে নিয়ে চলেন। সেজো বৌ অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী, পথে মৃত্যুপথযাত্রী তার সন্তানও। মেজ বৌ সবার চেয়ে ভিন্নমাত্রার চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে সামাজিক প্রথাকে ছিন্ন করার যেমন বিদ্রোহ আছে, তেমনি মাতৃত্ববোধে সামাজিক পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার রয়েছে মাতৃত্বের শাস্বত রূপ। পঁয়াকালে রাজমিস্ত্রি। পঁয়াকালের আয়ে সংসারের অনেকটা খরচ মেটানো হয়। গীর্জার খ্রিষ্টান পাদরী ও মিস জোন্স ছাড়াও অন্য আরেকটি খ্রিষ্টান পরিবার আছে, সেটিও নিম্নশ্রেণীর আর সে ঘরের বিবাহযোগ্য মেয়ে কুশি। কুশির বাবা মধু ঘরামী। মধু আগে মুসলমান ছিল। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

পঁয়াকালেদের এমনিতেই অভাবহীন সংসার তার মধ্যে তাঁর পাঁচি নামের এক বোন বাচ্চা পেটে নিয়ে তাদের বাড়ীতে চলে আসে। অভাব অনটনের মধ্যে পাঁচির সন্তান জন্মাবার পর পঁয়াকালের মা ক্ষণিকের জন্যে ভুলে যায় জীবনের যন্ত্রনা, তিনপুত্রের শোক। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ার লোকমুখে পঁয়াকালের মা শোনে, মেজ বৌ বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ধনাঢ্য কলকাতাবাসী বড়বোন জামাই ঘিয়াসুদ্দীন আহমদকে। এই নিয়ে পঁয়াকালের মা মেজ বৌ-এর সম্মুখীন হয় কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে। ঘটনাটি সে অস্বীকার করে। বড় বৌ মেজ বৌ-এর কথায় সমর্থন জোগায়। তবে পঁয়াকালের মার বিশ্বাস করার কিছু কারণও আছে। ঘাসুমিএগ একসময় ঘোড়ার গাড়ি চালাত কিন্তু হাতে পয়সা হওয়ায় ঘোড়ার গাড়িই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঘাসু মিএগ নাম থেকে সে সম্ভ্রান্ত নাম ধারণ করেছে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ। ঘরের স্ত্রী অর্থাৎ মেজ-বৌ-এর বোন রোগা হওয়ায় ঘাসু আরো দুটি বিয়ে করেছে। এখন সে ঘনঘন যাতায়াত করে মেজ বৌ এর বাপের বাড়ীতে। মেজ বৌ এর বাপের বাড়ি পঁয়াকালেদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। ঘাসু এলে মেজ বৌ এর মা চলে আসে মেজ বৌকে নিয়ে যাবার জন্যে। ঘাসু মেজ-বৌকে নিয়ে প্রায় দিনই গল্পে মেতে ওঠে। মেজ বৌ এর জন্যে একবার ঘাসু মিএগ একটি ঢাকাই শাড়ি উপহার আনে এবং মেজ বৌ এর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু মেজ বৌ তা গ্রহণ না করে তার বড় ভাবীকে দিয়ে দেয়। অবশ্য পঁয়াকালের মা, তার বোন পাঁচি, বড় বৌ মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মেজ বৌ-এর সাথে পঁয়াকালের বিয়ে দেবে। কিন্তু পঁয়াকালে রাজী হয় না। মেজ বৌ এই সিদ্ধান্তের কথা জেনেও না জানার ভান করে পড়ে থাকে। মেজো বৌ পঁয়াকালের সাথে বিয়েতে হয়তো রাজী হবে না এ বিষয়ে পূর্বধারণা করে রাখে বড় বৌ। দুটি সন্তানের ভালোবাসার জন্যে স্বামীর সংসারে অভাবের মধ্যেও থেকে যায়। পঁয়াকালে এই বিয়েতে রাজী না হবার কারণ কুশির প্রতি প্রেম। কুশিকে পঁয়াকালে ভালোবাসে। ফলে সে রাজী হয়ে না মায়ের দেয়া প্রস্তাবে।

সাহিত্যিকী

কুর্শির সাথে প্যাকালের ভাব বিনিময় ঘটে সুযোগ পেলেই। কিন্তু একদিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় তার বাড়ি ফেরার পথে রোতো কামারের সাথে কুর্শিকে দুটামি করতে দেখে কুর্শিকে সে ভুল বোঝে। একদিন কাউকে না বলে বাড়ি থেকে রানাঘাট চলে যায়। সেখানেই সে কাজ করে। টাকা পাঠায় মাঝে মধ্যে। চিঠিও লেখে বাড়ীতে। এর মধ্যে সেজো বৌ ও সেজো বৌ এর সন্তানের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় প্যাকালের মায়ের। প্যাকাল বাড়ি এসে কাউকে জীবিত দেখতে পায় না। মেজো বৌ-এর মৃত্যুর আগে খ্রিষ্টান মিশনারী থেকে চিকিৎসার জন্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল পাদরী, প্রতিদিন মেজোবৌ সহ খোকাকে ঔষধপথ্য দিয়ে যেতো মিস জোন্স। সেজো বৌ এর চিকিৎসা করতে এসে ভাল লেগেছিল মেজ বৌকে। ফলে জোন্স মেজ বৌকে পরামর্শ দেয় গীর্জায় যাবার জন্যে। জোন্স তাকে অনুপ্রাণিত করে এই বলে যে, খ্রিষ্টান না হয়েও সেখানে গিয়ে লেখাপড়া শেখা যাবে। সন্তানদের সাথে নেয়া যাবে। ওরাও প্রয়োজনে ওখানে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। পাড়ায় দুদিনের একটি গোলমাল হওয়ার কথা ভেবেও মেজবৌ রাজী হয় জোন্সের প্রস্তাবে। এবং শাশুড়ীকে না জানিয়ে জোন্সের কাছে যায় সে। এই সব ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে আসা নাজির সাহেবের বাসায় নাজির সাহেবের স্ত্রী খালাত ভাই আনসার আসে। আনসার আগে কংগ্রেসের কর্মী ছিল, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষিত বিত্তশালী সে। আনসার তার বিত্তথেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসে সর্বহারার দলে, বিত্তহীন মানুষের দলে, বস্তিবাসী নিম্নশ্রেণীর মেহনতী মানুষের পাশে। একটি শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করবে বলে সে এপাড়ায় এসেছে। আনসার মনে করে, শ্রমিক শক্তির উদ্বোধন না হলে দেশকে স্বাধীন করা দুঃসাধ্য।

আনসারের খালাত বোন লতিফার বাসায় মেজবৌ-এর যাতায়াত রয়েছে। এই সূত্রে আনসার জানতে পারে মেজ-বৌ খ্রিষ্টান হয়েছে। আনসারের ধারণা খ্রিষ্টান পাদরীর হয়তো প্রলোভন দেখিয়ে মেজ বৌকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছে। এ জন্যে একদিন সে পাদরীর সম্মুখীন হয়। এবং সেখানে পাদরীদের সামনে মেজ বৌকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে-মেজ বৌ এর খ্রিষ্টান হবার নেপথ্যকাহিনী। মেজ বৌ জানায় সমাজের ধর্মাত্ম মানুষের অত্যাচারে ও ক্ষুধার তাড়নায় সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। জোর করে বা লোভের টোপে ফেলে কেউ তাকে ধর্মত্যাগী করেনি। ফলে আনসারের আর কিছুই করার থাকে না। এখানে আনসারের প্রতি মেজবৌ-কিছুটা দুর্বল চিন্তের পরিচয় দেয়। আর এ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় হৃদয়বৃত্তিজাত। এই পরিস্থিতিটা পাদরী ও জোন্স উপলব্ধি করতে পারে। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নেয় মেজ বৌকে তারা বরিশাল পাঠিয়ে দেবে। তা না হলে কখন আবার আনসারের পরামর্শে মুসলমান সমাজে প্রত্যাবর্তন করে বলা যায়। বরিশাল তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পাঠিয়ে দেয়া হয় কুর্শি আর প্যাকালকে। কারণ কুর্শিকে পাবার জন্যে প্যাকালে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নেয়।

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' : ভিন্ন জীবনবোধ

আনসারের অবশ্য আরেকটি প্রেম পরিলক্ষিত হয়-জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিধবা মেয়ে রুবির সাথে। এ প্রেম সম্পর্কে আমরা হঠাৎ জানতে পারি লতিফার বক্তব্যের মধ্যে থেকে। লতিফাই প্রথম ঘটনাত্ৰমে রুবির প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিল আনসারের সামনে।

আনসার রাজদ্রোহির অপরাধে এ সময় চাঁদসড়কের নাজির সাহেবের বাসায় বন্দী হন পুলিশের হাতে। তাকে মুক্ত করার জন্যে এগিয়ে আসে বস্ত্রএলাকার সর্বশ্রেণীর পেশাজীবী। পুলিশের অনুরোধে-আনসার সাধারণ মানুষদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে। পুলিশের উপস্থিতিতে সে জানায় প্রত্যেকে যেন তেরী হয়ে তার স্থানটি পূরণ করার জন্যে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহে ফেটে পড়া জনতা ফিরে যায়। বন্দী অবস্থায় আনসার প্রেরিত হয় রেঙ্গুনে। পরে যক্ষা-রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যায় ওয়ালটেয়ারে। রুবির বাবা আকস্মিক কৃষ্ণনগরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বদলি হয়ে আসেন। রুবির সাথে দেখা হয় লতিফার। আনসারের সাথে রুবির মানসিক অবস্থার একটা দূরত্ব ছিল। তার অবসান ঘটে এখানে। বাড়ীতে খোকার অসুস্থ থাকার সংবাদ পেয়ে মেজ বৌ বরিশাল থেকে চলে আসে। খোকাকে সে দেখতে পায় না। তার আসার আগেই খোকা মৃত্যু বরণ করে। মেজ বৌ বরিশাল না গিয়ে পাড়াতেই থেকে যায়। খোকার মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মাথায় সে ভাবে গ্রামের খোকাখুকিদের নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবে। কিন্তু পাড়ার মড়ল আপত্তি জানালে মেজবৌ আবার মুসলমান হয়ে নিজ হাতে রান্না করে গ্রামের খোকাখুকিদের খাওয়ায়। লতিফার বাসায় মেজ বৌ, রুবির সামনে আনসারের পাঠানো চিঠি নিয়ে আলোচনা চলে। রুবি সিদ্ধান্ত নেয়-আনসারের সেবা করার জন্যে সে ওয়ালটেয়ারে যাবে। চাঁদ সড়কের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বেদনা; তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ ঘটনা ও পরিস্থিতি এবং আনসারের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও সমাজ চেতনা কি ভাবে নজরুল তাঁর জীবনবোধে নতুন দৃষ্টিচেতনায় নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তা উঠে এসেছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে।

পেটের ক্ষুধা মানুষকে কিভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়-তার একাধিক উদাহরণ এ উপন্যাসে বিদ্যমান। প্যাঁকালের বড় তিনভাই যে অভাব অনটনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেজো বৌ অসুস্থ হবার পর সে আর সুস্থ হতে পারে না (যদিও প্যাঁকালে মাঝে মধ্যে হোমিও প্যাথিক ডাক্তারের কাছ থেকে কখনো কখনো ঔষধ এনে খাইয়েছে এবং ছিটেন পাড়ার নকরি ডাক্তারের বৈঠকখানা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দেবার চুক্তিতে নকরি ডাক্তার দিয়ে সেজো বৌকে দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে তবুও অভাবের তাড়না থেকে সে মুক্তি পায়নি। মুক্তি পায় সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সেজো-বৌ-এর সন্তান ও রেহাই পায় না মৃত্যুর হাত থেকে। অভাব ও ক্ষুধার জ্বালায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে মেজ বৌয়ের খোকা মৃত্যুবরণ করে গজালের মা, অর্থাৎ প্যাঁকালের মা। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ তার ধর্মবিশ্বাস এবং জন্মার্জিত

সাহিত্যিকী

সংস্কার কিভাবে শিখিল করে দেয় তার বাস্তবধর্মী ছবি মধু ঘরামী। মধু ঘরামী মুসলমান অথচ অর্থের অভাব মোচনের জন্যে সে খ্রিষ্টান হয়ে ওঠে। সমাজের উৎপীড়নে মেজ-বৌ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের হাতে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও ক্ষুধার যন্ত্রণাও এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আনসারের সাথে মেজ-বৌ-এর কথোপকথন কালে মেজ-বৌ-এর উক্তি স্মর্তব্য,-

এই দুটোই আসার শত্রু। এখানে এসে তবু দু'বেলা দু'টো খেতে পাচ্ছি! ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি।^৫

তবে ধর্মত্যাগী হওয়ার পেছনে সমাজের পীড়নও কম দায়ী নয়। এক্ষেত্রে লেখকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল,-

- (ক) আমরা অল্পদিন হল কৃষ্ণনগর এসেছি, এর মধ্যে ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হয়েছে, তাতে বুঝেছি, ও আর যাই হোক, খারাপ নয়। ও বড্ডেটা অতিমানী। পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খ্রিষ্টান হল। জান যাদু, ও মেম-সাহেবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করত বলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে বলে কেবলি ভয় দেখাচ্ছি।^৬
- (খ) ধন্যবাদ দিয়ে আনসার প্রায়-প্রকম্পিতা মেজ-বৌর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা বলুন ত, আপনার হঠাৎ খ্রিষ্টান হবার কারণ কি মেজ-বৌ তার আনতনয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বললে, “আমি ত হঠাৎ খ্রিষ্টান হইনি।” আনসার হেসে ফেলে বললো, “তার মানে, আপনি একটু একটু করে খ্রিষ্টান হয়েছেন, এই, বলতে চান বুঝি” মেজ-বৌ তার সেই যাদুভরা হাসি হেসে বললে, “জিনা। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিষ্টান করেছেন।” আনসার তার বিস্ময়-বিস্করিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষন চেয়ে দেখল। তারপর সহানুভূতি-মাথাবক্ঠে বলে উঠল, “বুঝেছি, আমাদের ধর্মিক সমাজ কত বেশি অত্যাচার করে আপনার মত মেয়েকেও খ্রিষ্টান হতে বাধ্য করেছে।”^৭

মেজ-বৌ ব্যতিক্রমই বলা যায়। কেননা মেজ বৌ খ্রিষ্টান মিশনারীর মিস জোন্সের কাছে যেতো সেলাই ও লেখাপড়া শেখার জন্যে। তবে এটা ঠিক মিশনারীর অনেকের ক্ষুধার তাড়না ও অসুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে-এটা সত্য। মিনতি নামের হিন্দু মেয়েটিকেও সমাজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে ধর্মত্যাগী হয়ে খ্রীষ্ট ধর্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। মেজ বৌ-এর প্রায় সমবয়সী মিনতি হিন্দু ঘরের বৌ ছিল। স্বামীর অত্যাচার সহিতে না পেরে খ্রিষ্টান হয়ে ডাইভোর্স নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে নামে। একই শ্রেণী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও পাড়ায় একজাতের মানুষের মানুষ অন্যজাতের মানুষকে খোঁট্টা দিতে দ্বিধা করে না। এটাও সমাজের দুর্বলতার কারণে ঘটেছে। প্যাকালে কুলিকে ভালবাসে। তাদের প্রেমটা ধর্মীয় কারণেই সমাজে অনুমোদন লাভ করতে পারেনি। প্যাকালে অবশেষে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে কুর্শিকে বিয়ে করে।

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' : ভিন্ন জীবনবোধ

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে অর্থনৈতিক মুক্তি এলেও মানবধর্ম ও হৃদয়ধর্মের মুক্তি যে আসেনি এটিও নজরুল মেজ-বৌ-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত করেছেন। মেজবৌ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর আনসার গীর্জায় দেখা করতে গেলে, আনসার ফেরার সময় মেজ বৌ এর ছেলেমেয়েদের হাতে দুটি টাকা গুজে দিলে পাদরী সাহেব ও মিস জোন্স তা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। লেখকের বর্ণনা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য,-

মিস জোন্স এবং পাদরী সাহেব এ সবই লক্ষ্য করছিল। এইবার পাদরী সাহেব একটু অসহিষ্ণু হয়েই মেজ-বৌর ছেলেমেয়েকে আদেশের স্বরে বলে উঠল, “এই। টোমরা ও টাকা এখনি ফিরিয়ে দিয়ে এস।”^{১৬}

শুধু তাই নয়, আনসারের সাথে মেজ বৌ-এর প্রণয়ভাব দেখে পাদরী সাহেব ও মিস জোন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-মেজ বৌ কে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। একসময় মেজ বৌকে তার সন্তানদের ছাড়াই বরিশাল পাঠিয়ে দেন। এবং মিনতিবু দিয়ে সেখানে তাকে চোখে চোখে রাখেন যাতে মেজ-বৌ কোথাও সরে না পড়ে। একধরনের পরাধীনতা এখানেও কাজ করে। এসবের মূল কারণ যে ইংরেজ সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের গভীরে নিহিত, নজরুল তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে সূক্ষ্মভাবে উঠিয়ে এনেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য,-

এদেশে ইংরাজ শাসনের অন্যতম অভিশাপ,-তাদেরই সৃষ্ট অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে তারা এদেশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে পর্যন্ত হরণ করেছে। চাঁদ সড়কের বক্তাবাসীদের ওমান কনুই (রোমান ক্যাথলিক) হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে নজরুল এই চিত্রটাই তুলে ধরেছেন এবং স্পষ্টতঃ দেখিয়ে দিয়েছেন, ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের দুর্ভাগ্যের আংশিক পরিবর্তন হলেও আসলে তার মূল রয়েছে এক বিকট সামাজিক বৈষম্যের গভীরে।^{১৭}

সমাজ এতই নিষ্ঠুর আচরণ করে যে, প্যাঁকাতে ও মেজ বৌ ধর্মত্যাগী হলে প্যাঁকালের মাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার ফতোয়া জারী করে। অথচ প্যাঁকালের সংসারে নিত্য অভাব লেগেই থাকে। সংসারে যাপিত জীবনের কষ্ট যন্ত্রণাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী পতিরা উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই ফতোয়া জারী করতে দ্বিধা করেনি। ফতোয়া জারীর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো,

পাড়ার মসজিদের মোস্তা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেরে বাড়ি মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কাণই মওলানা হযরত পীর গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে এই গোমরাহ্ বেন্দীনদের নসিহত ও দরকার হলে 'বহস' করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ির ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনের টাকা যোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।^{১৮}

আনসার চরিত্রে হৃদয়ঘটিত প্রেমিক সন্তার উদ্বোধন ঘটতে দেখা গেছে রুবি বা মেজ বৌ এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আনসারের প্রেমিক সন্তা বিপ্লবী সন্তাকে ছাপিয়ে উঠতে

সাহিত্যিকী

পারেনি এই উপন্যাসে। আনসারকে কেন্দ্র করে রুবির যে প্রেম এবং আনসারের প্রতি মেজ-বৌ-এর যে হৃদয়ানুভূতি এসবও জীবনবোধের ভিন্নমাত্রায় চিত্রিত।

রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল সমারোহ পরিলক্ষিত হয়েছে আনসারের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অবশ্য সামাজিক সচেতনতাও তার রাজনৈতিক সত্তার সাথে একাকার হয়ে কাজ করেছে। রাজনৈতিক কারণেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে সিলেট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর বিশেষ একটি লক্ষ্য রয়েছে। এ সম্পর্কে আনসারের বক্তব্য তুলে ধরা হলো,-

একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিকসঙ্ঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়ত মাসখানেক বা তারও বেশি থাকতে হবে। এইত ময়মনসিংহ-এ দু'মাস থেকে এলাম।^{১৭}

পুলিশদের দেয়া রাজনৈতিক অপরাধীদের বিভিন্ন কোড নাম্বার থাকে। আনসারেরও রয়েছে ১০৯ নম্বর কোড। এই কোড নাম্বার দেখে আনসারের গতিবিধি লক্ষ রাখা হয়। আনসারের পেছনে লেগে থাকে সি আই ডি পুলিশ। আনসার যার নাম দিয়েছে টিকটিকি।

আনসার তার রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করে মেহনতী মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দেখতে চেয়েছে। আনসারের উক্তি উল্লেখযোগ্য,-

আমি তো কোনো দিন কারুর কাছে বলিনি ভাই, যে, আমার কোনো-কিছু নেই-কেউ কোথাও নেই। দুনিয়ার সব মানুষ একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোট্টে সুখের সন্ধান, কেউ ছোট্টে দুঃখের সন্ধান। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয় পরিজনের কেউ নেই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অন্যাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।^{১৮}

নীচুতলায় মানুষদের আত্মপরিচয় দান করার প্রত্যয়ে আনসার তাদের মাঝে অবস্থান করে। আপন ক্ষমতায় বিশ্বাস এনে তার প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের ভাগ্যের যে পরিবর্তন করা যায় এ ব্যাপারে সংগ্রামী চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে সে। অবশ্য আনসার তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা না বললেও পশু সমাজ-ব্যবস্থার যে একটা পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সে পরিবর্তন মেহনতী-মানুষের হাতে সমাজের ওপর আঘাত হানার মাধ্যমেই আসবে আনসার তা জোরালো ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। এই আঘাত হানবার জন্যে যে স্থায়ী ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের প্রয়োজন তা নজরুল আনসারের রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটিয়েছেন।^{১৯} আনসারকে পুলিশ বন্দী করলে বস্তিবাসী সংগ্রামে মেহনতী মানুষ তার মুক্তির জন্যে ছুটে এলে, আনসার তাদের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়ার জন্যে যে বাণী উচ্চারণ করে, সে বাণীর ভেতর দিয়ে মেহনতী

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' : ভিন্ন জীবনবোধ

মানুষ তাদের বিপ্লব-আন্দোলনের পথের দিশা উপলব্ধি করতে পারে। আনসারের উক্তি নিম্নরূপ,-

বন্ধুগন! আমার বিদায় কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ে না! তোমাদেরও হয়ত আমার মত করেই শিক্ষা পরে ছেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সবল রকমে কষ্টদেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ে না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়োনা। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের গুনাহানে গিয়ে দাঁড়াবে। ...
... ..যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনদিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার কর- সেই হবে আমারও বড় উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিও হব মুক্ত। এসেছ, নমস্কার নাও, আমার দোষ-ত্রুটি অপরাধ ক্ষমা কর, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্গবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না। আমি ভেসে চলবুম দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো।^{১২}

নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা'র পরিসমাপ্তি যে ভাবে ঘটেছে তার শিল্পসত্তা এবং এই শিল্পসত্তার দৃষ্টিকোণ উপন্যাসের সার্থকতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক করা চলে, তারপরও বলা যায়-নজরুলের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত এই উপন্যাসের সমাজ ও রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলনে। আর এই সমাজ ও রাজনীতি ভাবনার সাথে যুক্ত হয়ে আছে মানবতাবোধ ও স্বাদেশিকতা।

তথ্যনির্দেশ

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে', দেব পাৰলিপিং, বনকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১২
২. আতোয়ার রহমান, 'কথাসিল্পী নজরুল,' নজরুল সাহিত্য, (সে) মীর আবুল হোসেন, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭২ (খ্রিঃস), পৃঃ ১৫৫
৩. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (স) আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৬০৪
৪. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (স) আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৯৯-৬০০
৫. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (স) আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৬০২-৬০৩
৬. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (স) আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৬০৪
৭. আতোয়ার রহমান, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৪
৮. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৯৯
৯. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৯৩
১০. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (স) আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৯২
১১. আতোয়ার রহমান, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৬
১২. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬০৯-৬১০

A-609